অরণ্যের অধিকার : দেশজ-লোকজ ঘরানার আধারে প্রতিবাদের আখ্যান

আজিমূল হক

এক

তখনো পঞ্চাশের দশক শেষ হয়নি, জীবনে ঘটে চলেছে একের পর এক ঘটনা। ১৯৪৭ সালে বিজন ভট্টাচার্যের সাথে বিয়ে। শ্বশুরবাড়িতে তাকে বাস করতে হয়েছে বারো ফুট বাই বারো ফুট তিনখানা ঘরে রুগ্ন শ্বশুর, শ্বাশুড়ি, পাঁচ ভাই, তিন বোনের সংসারে। তবুও ছোট্ট ঘরকে সম্বল করেই চলছিল ছেলেকে সামলানো। হাজার কাজের ব্যস্ততা। সে ঘরও ভেঙে গেল ১৯৭৫ সালে। ছেলেকে ফেলে আসা মনখারাপকে সাথে নিয়েই চলছিল সাবান, কাপড় রং করবার সরঞ্জাম বিক্রি এবং আমেরিকায় বাঁদর চালান দেওয়ার টেন্ডার পাওয়ার ব্যর্থ প্রচেষ্টা। ষাটের দশকের মাঝামাঝি এসে তিনি জীবন ও ইতিহাসের পারস্পরিক সম্পর্ক নিয়ে নতুন ভাবনা চিন্তা শুরু করলেন। তার আগে সার্কাসের শিল্পীদের জীবন নিয়ে লিখে ফেলেছেন 'প্রেমতারা'। লিখে ফেলেছেন এক নিঃসঙ্গ মহিলার স্নিগ্ধ বিষণ্ণ বিষাদ-স্মৃতিচারণ নিয়ে 'বায়োস্কোপের বাক্স'। ইতিহাস যেহেতু তাঁর জীবনের অন্যতম প্রিয় বিষয়, তাই হয়তো উপন্যাসের ঘর-দোর একটু বেশিই ইতিহাস মাখা। কিন্তু এ ইতিহাস কোনো রাজ-রাজাদের ইতিহাস নয়। তাঁর ইতিহাস দেশের লক্ষ লক্ষ আদিবাসী, বিভিন্ন উপজাতি ও বিভিন্ন প্রদেশের দুর্গম অঞ্চলের যে মানুষ এখনও জোতদার - মহাজন-দিকু বাড়িতে জন্মদাস হয়ে আছে। 'আঁধারমানিক' গ্রন্থের ভূমিকাতে চোখ বোলালেই বুঝে নিতে অসুবিধা হয় না মহাশ্বেতার ইতিহাসবোধ— ''ইতিহাসের মুখ্য কাজই হচ্ছে একই সঙ্গে বাইরের গোলমাল, সংগ্রাম ও সমারোহের আবর্জনা ও ধ্বংসস্তূপ সরিয়ে জনবৃত্তকে অন্বেষণ করা। অর্থ ও তাৎপর্য দেওয়া। আর তখনি এই ভিতরপানে চোখ মেলার দরুণই অনিবার্যভাবে বেরিয়ে আসে সমাজনীতি ও অর্থনীতি; বেরিয়ে আসতে বাধ্য। কেননা সমাজনীতি ও অর্থনীতি শেষ পর্যন্ত রাজনীতির পটভূমি তৈরি করে। তার সিদ্ধি ও সাফল্য এনে দেয়। এই সমাজনীতি ও অর্থনীতির মানে হল লোকাচার, লোকসংস্কৃতি, লৌকিক জীবনব্যবস্থা।''

এ ভূমিকাতে আরও দেখতে পাই— ''কালপ্রবাহের একটি বিশেষ শক্তি আছে, তাকে কোনমতে অস্বীকার করা চলে না। এই অনস্বীকার্য শক্তির অর্থ হাওয়ায় গা ভাসানো নয়। মানুষই রাজনীতি সমাজনীতি ও অর্থনীতি তৈরি করে। এক কথায় মানুষের হাতের তৈরি হয় ইতিহাস। আবার এই মানুষই তার আচার - ব্যবহার, জ্ঞানে-বিজ্ঞানে, বিবেক ও বিবেকহীনতায় সেই অনিবার্য কালপ্রবাহকে ঘনিয়ে তোলে। এই প্রবাহের দুটি অপরা গতি আছে। এক হয় তাতে পরের ইঙ্গিত থাকে, নয় বিপর্যয়ের। যখন ধর্ম অর্থ রাষ্ট্র সমাজ পারস্পরিক সামঞ্জস্য হারিয়ে ফেলে, তখন কেবল রাজরাজড়ার জাঁকজমক, সিংহাসনের আশপাশে ঘোর অন্ধকার। তলোয়ারের খাপে খাপে শুকিয়ে থাকা রক্ত আর বাদশা-বেগম-বাদীর উতলা কিস্‌সায়া উত্তাল হয়ে ওঠে দিগ্বিদিক, তখনই ইতিহাস গা-খুলে তার ভিতরকার ফোসকাগুলো দেখায়। সব দেশেই তাই হয়। ভারতবর্ষের ইতিহাসেও তা—ই হয়েছে।''

উপরের উদ্ধৃতি দুটির সঙ্গে মিলিয়ে পাঠ নিলে দেখা যাবে একটি অন্য স্বর, ভিন্ন কণ্ঠ বেরিয়ে আসছে এ পর্বের মহাশ্বেতার উপন্যাসিক বয়ান থেকে। সেখানে দেখি— প্রথমত, ইতিহাসের রোমান্স লিখতে তিনি আর আকর্ষণ বোধ করছেন না। দ্বিতীয়ত, ইতিহাসের মানুষের মধ্যেও যে জনবৃত্তের আকাঙ্খা আছে তার প্রতি প্রলুব্ধ হচ্ছেন লেখিকা— হচ্ছেন মানুষের হাতে তৈরি ইতিহাসের কণ্ঠস্বরটাকে প্রকৃত স্বরূপে ধরার বাসনায়। স্পষ্টতই এ মেজাজের মহাশ্বেতা 'তিমির লগন' থেকে 'বাসস্টপে বর্ষা' পর্যন্ত মধ্যবিত্ত-উচ্চবিত্তের মনোকূটের রহস্য-উন্মোচনকারিনী নন। এ মেজাজের সাথে মিল পাওয়া যায় 'অরণ্যের অধিকার'-র লেখক- মেজাজের। মহাশ্বেতা এ পর্বে ইতিহাসের মানবের, গণমানবের আকাঙ্খাকে মূর্ত করতে চাইছেন। তাঁর উপন্যাসভাবনার এ পর্বকে আমরা এইভাবে চিহ্নিত করতে পারি— মানুষের হাতে তৈরি ইতিহাসের পটে গণ-মানুষের গণ-আকাঙ্খার সত্য অন্বেষণ পর্ব।

দুই

'অরণ্যের অধিকার' গ্রন্থাকারে প্রকাশের সময় এর ভূমিকাতে মহাশ্বেতার স্বীকারোক্তি এরকম— ''ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে বীরসা মুণ্ডার নাম ও বিদ্রোহ সকল অর্থেই স্মরণীয় ও তাৎপর্যময়। এদেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক পটভূমিকায় তাঁর জন্ম ও অভ্যুত্থান— তা কেবলমাত্র এক বিদেশি সরকার ও তার শোষণের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ নয়। একই সঙ্গে এ বিদ্রোহ সমকালীন ফিউডাল ব্যবস্থার বিরুদ্ধেও। এ সমুদায় ইতিহাসের বিবেচনা ভিন্ন বীরসা মুণ্ডা ও তার অভ্যুত্থানের যথার্থ বিবেচনা অসম্ভব।

লেখক হিসাবে, সমকালীন সামাজিক মানুষ হিসাবে, একজন বস্তুবাদী অপরাধ সমাজ কখনই ক্ষমা করে না। বিরসাকেন্দ্রীক উপন্যাস সে অঙ্গীকারেরই ফলশ্রুতি। তবু উপন্যাস সর্বদাই আঙ্গিকরীতি মেনে চলে। এ উপন্যাসও তাই শেষ করতে হয় বীরসার মৃত্যুতে।...''

লক্ষণীয় শেষের বাক্যটি— 'তবু উপন্যাস সর্বদাই আঙ্গিকরীতি মেনে চলে।' বীরসার মৃত্যু ঘটানো মহাশ্বেতার উপনাসের আঙ্গিকরীতিতে যদি অন্যতম বৈশিষ্ট্য হয় তাহলে এ উপন্যাসের আঙ্গিকরীতি আর একটা বিপ্লব ঘটিয়েছেন তিনি, তা হল উপনাসে দেশজ-লোকজ ঘরানার উপস্থিতি। পাশ্চাত্য সাহিত্যের ব্যাপক প্রভাবের কারণে উপনিবেশের কালে বাংলা উপন্যাসে একটি কথনরীতি গড়ে উঠলেও দেশজ কথনরীতির প্রভাবে একটি সমান্তরাল কথনরীতিও কোন কোন সময় দেখা দিয়েছে। তাই দেখা যায় বাংলা উপন্যাস সৃষ্টির প্রথম লগ্নে বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস ছিল নিখুঁত একটি কাহিনিবৃত্ত। কিন্তু ত্রৈলোক্যনাথের মতো কথাকারের রচনাগুলিতে সেই নিটোল কাহিনি রচনার প্রচেষ্টা নেই, বরং এদেশীয় প্রাচীন পরম্পরার গল্প বলার ভঙ্গিটি রয়েছে। এ কথনরীতিটি কোন একটি নির্দিষ্ট মুহূর্তে আবির্ভূত হয়নি, বহুকাল যাবৎ আমাদের দেশে প্রচলিত ছিল রীতিটি। তাই দেখা যায় জাতক-পঞ্চতন্ত্র-কথাসরিৎসাগরে এই রীতিটি রয়েছে। আবার কালিদাস তাঁর 'মেঘদূত' কাব্যে উদয়নকথাকোবিদ বৃদ্ধদের কথা বলেছেন যেখানে তাঁরা আসলে গল্প বলেন এবং এই ধরনের রীতি অনুযায়ী গল্পকে পরিবেশন করেন। বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে ত্রৈলোক্যনাথ যদি উপন্যাসের দেশজ নির্মাণের ধারাটিকে বজায় রেখে থাকেন অথবা আধুনিক যুগে তার নির্মাতা তথা প্রবর্তক হন তবে তার সার্থক উত্তরসূরী নিঃসন্দেহে তারাশঙ্কর বিভূতিভূষণ- শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় - মহাশ্বেতা দেবী- ভগীরথ মিশ্র-সোহাবার হোসেনরা।

উপন্যাসের দেশজ-লোকজ নির্মাণের অন্যতম প্রধান লক্ষণ কথকতার ভঙ্গি। অর্থাৎ এই ভঙ্গিটিতে থাকে বক্তা-শ্রোতার বৈঠকে কথোপকথনের ধারা। বক্তা যেন বৈঠকে কিংবা আসরে গল্প কিংবা কথা বলে যাচ্ছেন, অধীর আগ্রহে শ্রোতা তা শুনে যাচ্ছেন। কখনো কখনো শুনতে শুনতে মনেও নানা ধরনের প্রশ্ন জেগে উঠছে। উপন্যাসে ধানী মুন্ডার স্মৃতিচারণের স্মৃতিটি এ প্রসঙ্গে আমাদের মনে পড়বে। যখন সে মুন্ডাদের উদ্দেশ্যে বলছে:

''হাঃ দেখ, বীরসার বংশের আদিপুরুষ ছোটনাগপুর পত্তন করে। কিন্তু রাজা হল অন্য। সে হতে আমাদের মাটিতে জঙ্গলে বাইরে হতে লোক এসে সব কেড়ে নিল। অন্য জাতের, অন্য দেশের মানুষ। চারিদিক থেকে মানুষ এসেছিল। যারা এসেছিল তারা দিকু... হাঃ দেখ, দিকু ঘোড়া চায়, মুন্ডা পয়সা দিবে। দিকু পাল্‌কি চায়। মুন্ডা পয়সা দিবে। কাঁধ বইবে। দিকু যা চাই সব দিতে মুন্ডা। দিকুর ঠিকাদারকে সাহেবের আদালতে জরিমানা করলে টাকা জোগাবে মুন্ডারা। তা বাদে জোর করে ধরা লিয়া করাবে মুন্ডাকে। তা বাদে উচ্ছেদ করে দিবে।''

এখানে 'হাঃ দেখ' — শব্দদুটি দিয়ে বাক্যটি শুরু হওয়াতেই যেন বক্তা-শ্রোতার সম্পর্ক স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

আমরা এও জানি যে শিল্পী বীরসার স্বপ্ন ছিল শুধু তার মা কুরমী-কে নিয়ে কিন্তু সংগ্রামী বীরসার স্বপ্নের ভূমণ্ডল অনেক বেশি বিস্তৃত অনেক বেশি প্রসারিত। এই পর্বে তার সংগ্রামের ভাবনাজাল গোটা মুন্ডা সমাজকে কেন্দ্র করে। সেই নিজেকে আরণ্যক সন্তানরূপে উপলব্ধি করবার পরই জননী অরণ্যের কান্না মর্মে অনুভব করতে পারল সে। এই সূত্রে উপন্যাসের একটি বিশেষ অংশ মনে পড়ে যেখানে অরণ্যের সাথে বীরসার কথোপকথন চলে—

''...অভিমানে অবুঝ, দরিদ্র, নিঃস্ব, মুন্ডা জননীর মত কাঁদছিল অরণ্য, বীরসা শুনেছিল।

—হ্যা আমি অশুচ রে?

—শুচ করে দিব মা গো।

—হা দেখ্ দিকুতে-সাহেবে মিলে মোরে বারে বারে অশুচ করে।

—শুচ করে দিব তোকে।

—আমাদের ছেলেদের ঘর ছাড়া করে দিয়েছে।

—তাদেরকে ফিরায়ে আনব।

—মুন্ডা-কোল-ওঁরাও-হো-সাঁওতাল সকলে আড়িয়াকাটির ডাকে চলে যায়।

—যেতে দিব না।

—কে তোমারে লেংটা করেছে মা?

—যারা অশুচ করাছে।

—আমি তোমারে রক্ত দিব।

—দে বাপ মোর।

—তোমার লাজ ঢেকে দিব।

— দে বাপ মোর। ওরা মোরে লেংটা বেবস্ত্র করে আকাশের নিচে ছেড়ে দিয়েছে। তুই মোর লাজ ঢেকে দে।

—দিব গো দিব।''

এই নির্মাণের ক্ষেত্রে দেখা যায় উপন্যাসের কথনরীতির সর্বজ্ঞ দিকটি অর্থাৎ 'Omniscient point of view'-এর দিকটিকে তিনি পরিহার করেছেন সযত্নে। এক্ষেত্রে কথক যেন শ্রোতাকে গল্প শুনিয়েছে আবার

লেখকও সর্বোচ্চ কথনরীতির মতো শ্রোতাকে চরিত্র হিসাবে দেখাননি।

দেশজ-লোকজ আঙ্গিকের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হল আখ্যান-কথা বৃত্তান্ত, আখ্যায়িকা কিংবা পাঁচালীর বয়ান সংক্রান্ত দিকটি, অর্থাৎ গড়ে ওঠার দিকটি। দেশজ আখ্যানে পাশ্চাত্যের রচনার মতো আদি মধ্য অন্ত্য বিন্যাস থাকে না, বরং সেখানে থাকে একধরনের শৈথিল্য। সাথে থাকে লোকভাবনা কিংবা লোকায়ত কথা। উপন্যাসের ধানী মুন্ডার স্মৃতিচারণের সূত্রে একটা গান উঠে এসেছে।

''বেঠবেগারী দিতে মোর কাঁধে ঝরে লৌ গো/জমিদারের পেয়াদা এই রাতে দিনে/ তাড়ায় মোরে, কাঁদি আমি রাতে দিনে/ বেঠবেগারী দিয়ে মোর এই হাল গো—/ ঘর নাই সুখ মোরে কি দিবে গো/ কাঁদি আমি রাতে দিনে। চোখের জলের মতই লুনপাড়া মোর লৌ গো।''

এ গান অত্যাচারিত মুন্ডা জীবনের সত্যরূপকে স্পষ্ট করেছে। বহিরাগত মহাজন-ভূস্বামী-জমিদাররা, দিকুরা বারে বারে মুন্ডাদের পত্তন করা ঘুটকাট্রিগাম হতে, জঙ্গল হতে উচ্ছেদ করেছে। বেঠবেগারীর নিয়ম করে লাঞ্ছনা দিয়েছে। অতীতে যে স্বপ্ন-সুন্দর স্বাচ্ছন্দ্যে মুন্ডারা বিরাজ করতে সেই স্থান থেকে বিচ্যুত করেছে। গানে সেই ইতিহাসটাই মূর্ত। সদর্থে ইতিহাসের লেখন ও যুগরস—সবই যেন গানে বিধৃত। গান এখানে হয়ে উঠেছে আখ্যানের বাহক— যা দেশজ-লোকজ কথায় পুষ্ট—সত্যের উন্মেষক।

দেশজ-লোকজ আঙ্গিকে রূপকথা-উপকথার অন্তরঙ্গতাকে উপলব্ধি করা যায়। রূপকথায় থাকে সহজভঙ্গি, থাকে সত্যদৃষ্টি। অনেক ক্ষেত্রেই জীবনের চেনা জানা ঘটনার সঙ্গে রূপকথা উপকথার সাদৃশ্য উপলব্ধি করা যায়। আজ আর নতুনভাবে বলার নেই শিশুসাহিত্যের অন্দরেও কিভাবে কলোনি যন্ত্রনা ছড়িয়ে থাকে। আসলে উত্তর-উপনিবেশকালে উপন্যাস রচনার সময় উপনিবেশ পর্বে গড়ে ওঠা উপন্যাসের প্রথাগত আদলকে পরিহার করতে চান মহাশ্বেতা। যে মধ্যবিত্ত সীমাকে কেন্দ্র করে উপন্যাসের আঙ্গিক গড়ে উঠেছে, সেই সীমাকেও সচেতনভাবে লঙ্ঘন করেন তিনি। উপন্যাসের তৃতীয় পরিচ্ছেদ দেখলেই বোঝা যাবে বয়ানে কিভাবে রূপকথার মেজাজ চলে এসেছে—

''সে অযুত নিযুক্ত চাঁদ আগেকার কথা। পৃথিবী তখন কঠিন হয়নি। সবকিছু ছিল হরম্ আসুলের সরাসরি শাসনে। যখন সেই ছেলেটা আর মেয়েরা কাঁকড়ার গর্তে ঘুমোচ্ছে, তখন হরম্ আসুল জল ঢেলে পৃথিবীর আগুন নেভালেন।

আগে সৃষ্টি করলেন জলের জীব। মাছেদের ডেকে বললেন— সাগরের নিচু থেকে মাটি আন। ডাঙার জীব সির্জাব। সাগর মাটি দেবে কেন? মাছেরা মুখে করে মাটি নিয়ে ভেসে ওঠে। সাগরের ঢেউ মাটি ভাসিয়ে দেয়।...শেষে কেঁচো উঠে এল। পেটের মাটি মলের সঙ্গে বের করে দিল। সেই মাটিটুকুই পেলেন বলে হরম্ আসুল স-ব গড়লেন।'

দেশজ-লোকজ আঙ্গিকের চতুর্থ বৈশিষ্ট্যটি হল মিথনির্ভর কাহিনির উপস্থাপনা। এ কাহিনি আসলে যুক্তিনির্ভর (Age of Reason) যুগে সৃষ্টি হয়নি, সৃষ্টি হয়েছে বিশ্বাসবাদ যুগে। তাই এই (Age of Faith)-এর কাহিনিতে যুক্তির দৃঢ় বন্ধন থাকে না, বরং অলৌকিকতা থাকে অনেক বেশি। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য মানবসভ্যতার ক্রমবিকাশের ধারার সঙ্গে পুরাকথা অর্থাৎ মিথ এবং পুরাণের সৃষ্টি গভীরভাবে সম্পৃক্ত। পুরাকথা বা মিথ পুরাণের পূর্বে সৃষ্ট হয়েছে। মানবসভ্যতা অভ্যুদয়ের পরবর্তীকালে পুরানে কাহিনিমালা গড়ে উঠেছে। তাই পুরুণের কাহিনিমালায় মিথের উপাদান মিলেমিশে থাকে। প্রকৃতপক্ষে মানুষ যখন সভ্য হয়ে ওঠেনি তার আগেই উষালগ্নের মানুষেরা তাদের নিজস্ব অভিজ্ঞতাগুলোকে লিপিবদ্ধ করে রাখত না, শুনে শুনেই মনে রাখত। একজনের কান থেকে অপরজনের কান-এ বিবর্তিত হয় সে ঘটনার ধারা। কালক্রমে এ গুলি মিথের আকার নেয়। মিথের মধ্যেই কৌম সমাজের নানান বৃত্তান্ত উঠে এসেছে। প্রসঙ্গত আমাদের মনে পড়ে যায় পুরাকথা সৃষ্টির মূলে ক্লদ লেভি স্ট্রাউস দ্বিমাত্রিক বৈপরীত্য (Binary Opposition)-এর কথা বলেছিলেন যা 'নাগিনী কন্যার কাহিনি' উপন্যাসে সু ও কু , অমৃত ও বিষের ঘটনার সাথে মিলে যায়। বহু বিচিত্র অলৌকিক মিথ নিয়ে মুণ্ডাদের জীবন। তারা বিশ্বাস করে বিশালব্যাপ্ত 'সেংগেলদা' আগুনে পুড়ে যাবার পর পৃথিবী সৃষ্টি হয়েছিল। মানে যে মায়ের সন্তান মরেনি তাঁর ছোঁয়ায় পোয়াতির জীবিত সন্তানই প্রসব হবে। তারা জানে যে-জলে দেবতা থাকে তাতে স্নান করলে কুষ্ঠরোগ হয়। উপন্যাসে দেখি— মানুষ ও জগৎ সৃষ্টি সংক্রান্ত মিথ:

''সেই আদিযুগে সেংগেলদার আগুনে পৃথিবী জ্বলে ছাই হয়েছিল। সিং বোঙা আকাশ থেকে আগুন ফেলেছিল। তাতে সকল মানুষ জ্বলে মরে যায়। এক কাঁকড়ার গর্তে ছিল ঠাণ্ডা জল। মাটির বুকে ঠাণ্ডা জল। একটি ছেলে একটি মেয়ে। মুন্ডারি তারা,...আগুন দেখে থমকে দাঁড়াল। সিং বোঙা আকাশ থেকে মুখ নামিয়ে বললেন— আরে তোরা পালা। তোদের হাতে জনম মরণের ভার। তোরা হতে আবার জগৎ সির্জাব যে।

তারা বলল— কোথায় পালাব?

—ও-ই দেখ্।

আগুনরঙা সাপ, তিনি নাগদেবতা নাগীরা, তিনি ফণায় ঢেকে ছেলেটিকে আর মেয়েটিকে নিয়ে গেলেন

সেই কাঁকড়ার গর্তে। শীতল জলে তারা ডুকে থাকল। কতদিন নিদ্রায় গেল তারা জানে না। তারপর তারা সিং বোঙার ডাকে উঠে পড়ল।

বাইরে এসে দেখে কবে থেকে বৃষ্টি নেমেছে কে জানে। সিং বোঙা যেমন আগুন ঢেলেছিলেন তেমনি বৃষ্টি নামিয়ে বিশ্বভুবন ঠাণ্ডা করেছেন। কতদিন ধরে কে জানে।অরণ্য, নদী, পাহাড়, পশু, পাখি, ফুল, ফল, কীটপতঙ্গ—সব সৃষ্টি করেছেন।

সিং বোঙা মেঘ থেকে মাথা নামিয়ে হেঁকে বললেন—যা! জগতে সব আছে। মানুষ নাই। তোরা সির্জা।" (দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ)

দেশজ-লোকজ আঙ্গিকের বৈশিষ্ট্য হল— এর ভাষা হবে উপনিবেশের প্রভাবমুক্ত, এর ভাষা হবে নিজস্ব। আপাতদৃষ্টিতে তা অসচেতন প্রয়োগ বলেই মনে হয়। আসলে যে মধ্যবিত্ত সীমকে লঙ্ঘন করে মহাশ্বেতা লোকায়ত মানুষগুলিকে নিয়ে উপন্যাস নির্মাণ করেন, সেই মানুষগুলির উপযোগী ভাষারূপও তিনি দান করেন। লাতিন আমেরিকা, আফ্রিকার দেশগুলিও নানা সময়ে উপনিবেশের শিকার হয়েছে। সাম্রাজ্যবাদী আধিপত্যে দেশবাসী তাদের নিজস্ব সংস্কৃতি ভুলে গেছে কিংবা সুকৌশলে ভুলিয়ে দেওয়া হয়েছে। আমাদের দেশেও উপন্যাসের মতো শিল্পমাধ্যম গড়ে উঠেছে উপনিবেশের ছায়ায়। সেজন্য প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষ, গোচরে কিংবা অগোচরে আমাদের উপন্যাসেও দেশীয় ঐতিহ্যের ছায়া না পড়ে ভিন্ন এক কথনরীতি উঠে এসেছে কখনো কখনো। মহাশ্বেতা এ বাঁধা থেকে নিজেকে পুরোপুরি দূরে সরিয়ে রাখতে পেরেছেন, যেমন পেরেছিলেন মার্কেজ তাঁর 'একশো বছরের নিঃসঙ্গতা,' 'একটি পূর্বঘোষিত মৃত্যুর কালপঞ্জি', 'মৃত্যুর কড়ানাড়া', 'বারো অভিযাত্রীর কাহিনি' প্রভৃতি গ্রন্থগুলোতে। এ ধারার লেখকদের মূল কাজ হল নিজেদের সংস্কৃতিকে জানা—জানানো। নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তি ভাষণে মার্কেজ তাই বলেছিলেন—

''ইউরোপীয়রা যতটা যুক্তিবাদী সে অর্থে আমাদের মন মানসিকতা ঠিক ততটা যুক্তিবাদী নয়। হওয়া সম্ভবও নয়। আমরা যেভাবে বাস্তবতাকে প্রকাশ করি, ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করি, যুক্তিবাদীদের পক্ষে সেটাকে ঠিক সেভাবে বোঝা বা উপলব্ধি করা খুব কঠিন। লাতিন আমেরিকানদের দেখে মনে হবে তারা অর্ধেক স্বপ্ন আর অর্ধেক দুর্নীতির ভেতর জীবন কাটান, সদাবাস্তববাদ যাদের সহজাত ও স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য।"

শুধু তাই নয় উত্তর-উপনিবেশকালের নিজস্ব সময়ের স্বরূপ সম্পর্কেও জ্ঞাত হন প্রগতিশীল শিল্পী-লেখক-রাজনীতিবিদ ও অর্থনীতিবিদরা। ১৯৬৫ সালে ঘানার রাষ্ট্রপতি কোয়ামি ক্রুমা যখন 'নিও-কলোনিয়ালিজম: দ্য লাস্ট স্টেজ অফ ইম্পিরিয়ালিজম' গ্রন্থটি লেখেন সেখানে তিনিও বলেন উপনিবেশের ছায়ার থেকে প্রাক্-উপনিবেশ পর্বের ভাষায় জোড়া খুব কঠিন। ভারতবর্ষের মতো দেশেও এ ঘটনা ঘটেছে—ভুলিয়ে দেওয়া হয়েছে আমাদের জীবন-যাপনের সূক্ষ্ম অনুভূতিগুলিকে পর্যন্ত। মনে পড়ে যায় শঙ্খ ঘোষের 'কবিতার মুহূর্ত' বইটিকে।

''এক হিসেবে এক সংকটটা কেবল আমাদের দেশেরই নয়, এটা আমাদের সময়েই এক সংকট। যে কোনো সত্য উচ্চারণকে মিথ্যা আড়ম্বরের দিকে টেনে নিতে এখন আর সময় লাগে না বেশি। যে কোন বোধ বা উপলব্ধি মুহূর্ত মধ্যে হয়ে উঠতে পারে নিছক পণ্যমাত্র।"

মনে পড়তে পারে মিশেল ফুকোকেও। ফুকোর ভাষায়—

''We must cease once and for all to describe of effects of power in negative terms, it 'excludes', it 'Conceals', In fact power produces, it produces reality, it produces domains of objects and rituals of truth."

এক অর্থে ঔপনিবেশিক প্রতাপের বহুকৌণিক ও প্রলম্বিত ছায়া পড়বে সমাজে, জীবনে এবং সাহিত্যে। পড়বে সেই সময়ে যখন সময়টা সত্যিই বড় অসময়। যখন মেধা মৃতপ্রায়, কেন্দ্রীকরণ দ্বারা আক্রান্ত মনোভূমি, যখন উৎপাদনশীলতা প্রাধান্য পাচ্ছে সংস্কৃতিকে দূরে সরিয়ে।

'অরণ্যের অধিকার' -এ সমগ্র আখ্যান জুড়ে চরিত্রের বিবর্তনের ধারা কিংবা তাদের বাচন-এ উপনিবেশের কিংবা কেন্দ্রের আধিপত্যকে অস্বীকার করার তীব্র আকাঙ্খা দেখতে পাই। তাই সরকারি আপিসের বাবুরা যখন অতিরিক্ত অবহেলায় বীরসার আর্জিপত্র দেখে হো-হো করে হেসে উঠে 'তুই' বলে সম্বোধন করে, তখনই সে প্রতিবাদ করে ওঠে। ভেতরের বিদ্রোহকে আর্জি জানিয়ে 'বাবুদের' উদ্দেশ্যে তার তীক্ষ্ণ সংশ্লেষ জেগে ওঠে—

''তুই-তুই বলছ কেন? মুণ্ডারা মানুষ নয়? সাহেব দেখলে আপনি বল, বেনে দেখলে তুমি বল। মুন্ডা দেখলে তুই বল? এই দিকু! আমার নাম বীরসা। আমি সাহেব ডরাই না। ঠিক ভাবে কথা বল্।"

উদ্ধৃত অংশের বীরসার 'আমি সাহেব ডরাই না' —এই বাচনেই যেন স্পষ্ট হয় কেন্দ্রের প্রতাপকে তুচ্ছ করা অভিলাষ। এইভাবেই ঔপনিবেশিক বন্দুকের বিরুদ্ধে জেগে উঠেছে বিষ মাখানো তীর ও ধনুক।

দেশজ-লোকজ আঙ্গিকের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হল সেখানে সমসময়ের প্রতিফলন ঘটবে। মহাশ্বেতার 'অরণ্যের অধিকার' উপন্যাসে এর তীব্র প্রয়োগ দেখতে পাই। আসলে ঔপন্যাসিক যে জীবনের কথা

বলেন, সময়ের কথা বলেন, বলেন সমাজের কথা— তিনি সেই সূত্রে কিন্তু হয়ে ওঠেন জীবন, সময় ও সমাজের অংশীদারও। হাসান আজিজুল হক একেই হয়তো 'লেখকের উপনিবেশ' আখ্যা দিয়েছেন। মহাশ্বেতাও জীবনকে দেখতে চান, হয়ে ওঠেন জীবনের অংশীদারও। বাখতিনীয় দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে বিচার করলে এভাবে বলা যায়—

''চরিত্রে স্বাভাবিক বিকাশের পথ ধরেই মহাশ্বেতা দেশ-মানুষ-সমাজ ও শিল্পের কাছে দায়বদ্ধ থেকেছেন এবং তারই ফলে তাঁর লেখা হয়ে উঠল I with others -এর গভীর প্রতিফলন।''

আলো অন্ধকার মেশানো শোষণ-বঞ্চনায় জর্জরিত জীবনে সুখ-দুঃখ, আশা-নিরাশা, প্রেম-ঘৃণা যেমন দেখেন তিনি, তেমনি, তারই মধ্য দিয়ে তাদের মানবিক সত্তা ও আবিষ্কার করতে সচেষ্ট থাকেন। আসলে মহাশ্বেতা বিস্বাস করেন— 'যেখানে কোনো স্বপ্ন নেই, ঠিক তখনই স্বপ্ন দেখার সময়।'

বীরসাদের অর্থনৈতিক অবস্থাই বলে দিচ্ছে তাদের দুঃখজীবনের কোরাস। যেখানে বহু কষ্টে মুণ্ডারা জঙ্গল হাসিল করে সমৃদ্ধ জীবন যাপনের আশায়। কিন্তু তৈরী করা বাসভূমিতে নজর পড়ে সামন্ত ভূ-স্বামীর। বিদেশি সরকারের। সামন্তবাদী ভূমিব্যবস্থার সঙ্গে ধনবাদী মহাজন দালালের প্রকোপে মুণ্ডারা ভূমি ও জঙ্গলের অধিকারও হারালো। সত্যিই তো এভাবেই নীরবে কেন্দ্র সবসময় নিম্নবর্গের উচ্ছেদের মাধ্যমে গড়ে তুলতে চায় শপিং মল, মাল্টিপ্লেক্স কিংবা ঝা-চকচকে আধুনিক ফ্ল্যাট। 'হাসুলী বাঁকের উপকথা'র করালী, 'তিস্তাপারের বৃত্তান্তে'র বাঘারু কিংবা 'অরণ্যের অধিকার' -এর বীরসা-রা তাই ব্রাত্য হতে হতে এক সময় কুড়ুল হাতে রুখে দাঁড়ানোর সাহস রাখে নিজেদের হারানো জমিকে ফিরে পাওয়ার লক্ষে, কিন্তু বুদ্ধিজীবীদের তক্‌মা লাগে তাদের গায়ে, মুহূর্তেই তারা হয়ে ওঠে রাষ্ট্রের শত্রু। গায়ে সেঁটে যায় জঙ্গী অপবাদ। চলুন পাঠক, চোখ বোলাই ১৪ অগাস্ট, ২০১১-এর প্রতিদিন 'রোববার' পত্রিকার অনিন্দিতা গোস্বামীর কলমে— ''মানুষ আজ কোথাও আর নিরাপদ নয়। কোটি কোটি টাকা ব্যয়ে তৈরি হচ্ছে রাস্তাঘাট', দেশের প্রধান চারটি মহানগরকে ঘিরে তৈরি হয়েছে সোনালি চতুর্ভূজ। এই মূহুর্তে ভারতে সড়ক পথের দৈর্ঘ্য ৩.৩১৪ লক্ষ কিমি, যা বিশ্বে তৃতীয় দীর্ঘতম সড়ক সংযোগ আর রেলপথ ৬৪,২১৫ কি.মি., যা বিশ্বে চতুর্থ। অথচ ২০০৯ সালে সড়ক-দুর্ঘটনায় মারা গিয়েছেন ১.৬ লক্ষ মানুষ। ২০১০ -এর তার সঙ্গে যুক্ত হয় আরও অতিরিক্ত ৩০ হাজার। একটু সুলুকসন্ধান করলেই জানা যাবে এর মধ্যে বেশিরভাগই নিম্ন পরিবারের মানুষ, যাদের প্রায় ৪৮ শতাংশই যাতায়াত করেন সড়কপথে। ২০১০ থেকে এখনও পর্যন্ত রেল দুর্ঘটনা ঘটেছে প্রায় ২৬টি, যার প্রায় সব ক'টির পিছনেই ছিল নাশকতা, দুর্নীতি অথবা কর্তব্যে অবহেলা। অর্থের অসম বন্টনের মেরুকরণ হচ্ছে, বাড়ছে 'আছে' আর 'নেই' -এর ব্যবধান। আমাদের আহ্লাদের শহর, তার অভিজাত্যের উচ্চমহলকে ঘিরেই মুখ-ব্যাদান করে আছে অপুষ্টি, অনাহার, অস্বাস্থ্য নিয়ে বৃহৎ বস্তি অঞ্চল, যেখানে জন্ম নিচ্ছে, খুন, রাহাজানি, তোলাবাজি, ধর্ষণ, চুরি, ডাকাতি। ১৮৯২ সালে অকটাভিয়ান হিউম ধনী ও অবস্থাপন্ন কংগ্রেস নেতাদের সতর্ক করে বলেছিলেন, ''ইতিহাস বলে যে জনসাধারণ যতই শান্ত স্বভাবের হোক, এমন সময় আসে যখন অনাহার, অনাচার এবং হতাশা তাদের স্বভাবে নবরূপ পরিগ্রহ করে তাদেরকে হিংসাত্মক ও অপরাধমূলক কর্মে প্রবৃত্ত করায়। যদি আমরা দরিদ্র মানুষগুলোর জরুরি অভিযোগগুলোর প্রতিকার না করতে পারি তা হলে রাত্রির পর যেমন দিন আসে তেমনই ভয়ংকর বিদ্রোহ আত্মপ্রকাশ করবেই।'' কিন্তু আজ আমরা কাকে সতর্ক করবো?

নগরায়ণ, তথ্যপ্রযুক্তি, পেট্রো-রসায়ণ শিল্প, পারমাণবিক চুক্তি, এই সব ভারী-ভারী প্রকল্প অতশত জানি না, কিন্তু বছর দুয়েক আগেও ডুয়ার্সে বেড়াতে গিয়ে দেখেছি মাইলের পর মাইল চা বাগানগুলো ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। শ্রীহীন চা-গাছগুলো অবিন্যস্ত বেড়ে উঠেছে। জঙ্গলে ঢেকে গিয়েছে। বাগানের শ্রমিকদের ঘরগুলো ভেঙে পড়েছে, অনাহার-ক্লিষ্ট উলঙ্গ শিশুগুলো পর্যটকের জিপ দেখলেই বাড়িয়ে দিচ্ছে ভিক্ষের থালি। ঝোড়ো আন্দোলনে বিধ্বস্ত আসামের চা-বাগানগুলোতেও ঠিক একই অবস্থা। পঁচিশ-তিরিশ বছর আগেও এই চা-শিল্প থেকেই আসত আমাদের সবচেয়ে বেশি বৈদেশিক মুদ্রা। হুগলি নদীর দুই তীরে পাটকলগুলো ধুঁকছে। কত কলকারখানার গেটে ঝুলে গিয়েছে তালা। কত বন্দরের ঘটছে ক্রম-অবনমন। তার সমাধান না করে আমরা নতুনের দিকে পা বাড়াচ্ছি। ফলে প্রয়োজন হয়ে পড়ছে— জানলা বন্ধ করে কানে কানে আঙুল দাও।

ভলাদিমির দেদিজার তাঁর 'On Military Conventions' বইতে বলেছেন, ''নতুনতর বাজারের জন্য শিল্পে উন্নত বিভিন্ন দেশের লড়াই ও প্রতিযোগিতা জন্ম দিল এক স্থায়ী বৈরিতার— বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদ নামে পরিচিত মতাদর্শ ও তার প্রয়োগের মধ্যে দিয়ে যা প্রকট হয়। এই বৈরিতার উৎস যে শিল্প তার বিকাশ আরও বেশি বেশি মারণাস্ত্র উৎপাদনের মধ্যে দিয়ে কোনও এক প্রতিযোগীকে সুবিধাজনক অবস্থানে উঠে আসার রসদ জোগায়। এর ফলে হয় এই যে, যুদ্ধের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়ে কৃষক, শ্রমিক, এমনকি বাড়ির মেয়েরাও। আর অধীনস্থ জনগণের বিদ্রোহে ঔপনিবেশিক শক্তির একটাই উত্তর—নিপীড়ন আর গণহত্যা।''

অর্থাৎ বীরসাদের মতোই এই বঞ্চনার শিকার সমকালের অসম-ডুয়ার্সের চা-শ্রমিকরা কিংবা হুগলি নদীর পাটকলগুলোর শ্রমিকরা। আমরাও অপেক্ষায় থাকলাম অসম-ডুয়ার্স-হুগলির মধ্যে কোনো বীরসা জন্মায় কি না— যে বীরসা মুণ্ডার মতোই বলবে, 'আয় মা তোকে শুচ করে দিই।

দেশজ-লোকজ আঙ্গিকের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল তাতে জনসমাজের ক্ষোভ ও প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়। একথা আমার সবাই জানি যে 'অরণ্যের অধিকার' উপনাসে বর্ণিত সমাজব্যবস্থা মূলত বৈষম্যমূলক সমাজ। উচ্চকোটির দিকুদের দিক থেকে বৈষম্যমূলক আচরণ ও ব্যবস্থা নিপীড়িত মুণ্ডা সমাজের দিকে ধাবিত। মুণ্ড সমাজ সম্ভবত আবহমান কাল ধরেই এই বৈষম্যের শিকার। উপন্যাসের নায়ক বীরসা এই বৈষম্যের বিরুদ্ধে লড়াই দিয়ে মৃত্যুবরণ করেছে। উপন্যাসের শুরুতে এই বৈষম্যের স্বরূপ ও তার বিরুদ্ধে মুণ্ডাদের রুখে দাঁড়ানোর কথা আছে—

''মুণ্ডার জীবনে ভাত একটা স্বপ্ন হয়ে থাকে। ঘাটো একমাত্র খাদ্য যা মুণ্ডারা খেতে পায়, তাই ভাত একটা স্বপ্ন।... বেশিরভাগ সময়েই বীরসার উদ্ধত ঘোষণা, 'মুণ্ডা শুধা ঘাটো খাবে কেন? কেন সে দিকুদের মত ভাত খাবে না।" (নবম পরিচ্ছেদ)

মুণ্ড সমাজের এটাই এক নিয়তি। আসলে প্রান্তিকেরা সবসময় খাদ্য উৎপাদন করে, অন্যদিকে তার ফল ভোগ করে কেন্দ্র। মুণ্ডারাও পায় না মানুষের মর্যাদা—পায় না দিকুদের কারণে। শ্রেণিবিভক্ত সমাজের এমন বৈষম্যমূলক চিত্রের কথা উপনাসে বারবার উঠে এসেছে। যেমন:

১. ধানী মুণ্ডার বচনে : ''হা দেখ, দিকু ঘোড়া চায়, মুণ্ডা পয়সা দিবে। দিকু পালকি চায়, মুণ্ডা দাম দিবে। কাঁধে বইবে। দিকু যা চায় সব দিবে মুণ্ডা। দিকুর ঠিকাদারকে সাহেবের আদালতে জরিমানা করলে টাকা জোগাবে মুণ্ডা। তা বাদে জোর করে টাকা ধার লিয়া করাবে মুণ্ডাকে। তা বাদে উচ্ছেদ, করে দিবে। তখন আছে আড়কাঠি। তারা বোকা মুণ্ডাগুলিকে কুলি করে নিয়ে চলে যাবে সেই কোথা।...দেশ ছাড়লে মুণ্ডারা ফিরে না রে। তারা পথ চিনে না, বিদেশে মরে ভোখছানি লেগে।" (প্রথম পরিচ্ছেদ)

২. সালীর ভাবনায়: ''...মুন্ডা মানে জংলীটা, অসভ্যটা। মুণ্ডাদের জীবন দিকুদের জন্য। দিকুদের গোলায় ধান-সরসে-আখ উঠবে। দিকুরা এসে জঙ্গল - হাসিল জমি দখল করবে। বোঙা বুড়ির ধান—বালির জায়গা পাই নাই— খুটকুট্টি গ্রামের সব নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়ে সেখানে দিকুরা তাদের দেবদেবীর স্থান বসাবে। মুণ্ডাদের জীবন সেজন্যই। মুন্ডা কেমন করে মুন্ডা বলে গর্ব করবে? কেমন করে আত্মবিশ্বাস অটুট রাখবে?" (চোদ্দতম পরিচ্ছেদ)

দেশজ আঙ্গিকে থাকে মানুষের সংস্কার তথা লোকবিশ্বাসের কথা। থাকে না প্রবাদ-প্রবচন-ছড়ার ছড়াছড়ি। লোকসমাজের সামগ্রিক আচার। সেই সমাজে ব্যবহৃত সমস্ত কিছুই বিভিন্নভাবে প্রযুক্ত হয় এই আঙ্গিকে। এই উপন্যাসের ছত্রে ছত্রে নানা সংস্কার ও লোকবিশ্বাসের কথা আছে। এ প্রসঙ্গে মনে পড়বে দস্তয়েভস্কির উপন্যাস সমালোচনাকালে মিখাইল বাখতিন তাঁর কার্নিভাল সংক্রান্ত তত্ত্বে আদিম কৌম তথা গোষ্ঠী-সমাজের একটি সংস্কারগ্রস্ত উৎসব নিয়ে কথা আছে—যে উৎসবটি লোকায়ত সমাজের মানুষদের দ্বারা পালিত হয় ফসল ঘরে তোলার সময়ে। এই উৎসবে লোকায়ত সমাজের মানুষেরা উদ্দাম নৃত্য ও গীতের মধ্য দিয়ে তাদের আনন্দকে প্রকাশ করে। নানা ধরনের মুখোশ ব্যবহার করে। বাখতিন এই সংস্কারগ্রস্ত উৎসব প্রসঙ্গে কিছু তাৎপর্যপূর্ণ কথা বলেছিলেন। যে কোনো সমাজে আধিপত্যযুক্ত শ্রেণি তার দাপটকে কায়েম করতে চায় এবং আধিপত্য-বহির্ভূত শ্রেণিটি যদিও প্রতিটি পদক্ষেপে ক্ষমতাবৃত্তের মধ্যে প্রতিনিয়ত ধীরে ধীরে প্রবেশ করে ফেলে, তবু তারা অন্তরে অন্তরে সেই বৃত্ত থেকে বেরিয়ে আসতে চায়। বাখতিন সমাজসংস্কান্ত এই বিষয়টিকে সংস্কৃতি ও সাহিত্যের সঙ্গে অভিন্ন করে দেখাতে গিয়ে বললেন, লোকায়ত কৌম-সমাজ আয়োতি এই উৎসবে মুখোশ ব্যবহার, নৃত্য-গীত, প্রবাদ, ছড়া যদিও আধিপত্য - কায়েমে-সচেষ্ট সমাজের কাছে কখনো কখনো অশ্লীলতা বলে পরিগণিত, তবুও গভীরভাবে ভেবে দেখলে বোঝা যায় তা উদ্দামতা মাত্র নয়। প্রকৃতপক্ষে এই উদ্দামতার মধ্য দিয়ে তাঁদের যন্ত্রণাদগ্ধ হৃদয়ের তথা পীড়িত চিত্তের যেন একপ্রকার মোক্ষণই ঘটে। এই উদ্দামতার অন্তরালে রয়েছে গভীর সমালোচনা— এই সমাজ সমালোচনায় শাসক শক্তির উদ্দেশ্যে তীব্র ব্যঙ্গের কণ্ঠস্বরই যেন শোনা যায়। 'অরণ্যের অধিকার' উপন্যাসে বীরসাদের কোনো কোনো অন্ধবিশ্বাস-সংস্কার-এর মধ্য দিয়ে বেরিয়ে এসেছে নিজেদের উদ্দামতা কিংবা শাসক শক্তির বিরুদ্ধে তীব্র ব্যঙ্গের মাধ্যমে। যেমন—

ক. রা-পারব : ''শাল গাছে ফুল ফুটলে যৌবনে করমিরা 'রা-পরব' করেছে। মাথায় ফুল পরে মেয়ে-পুরুষে নেচেছে কত।" (১৬তম পরিচ্ছেদ)

খ. ''হোলিতে মুণ্ডারা আগুন জ্বালে। আগুন ঘিরে নাচে ও গান গায়।" (১৭ তম পরিচ্ছেদে)

গ. আরান্দি উৎসব : ''ভগবান হতে হলে অনেক বড় দাম দিতে হয়। সে জীবনে কোন বরযাত্রা নেই, বাজনা বাজিয়ে মেয়েরা আমপাতায় জল ছিটিয়ে বরকে নামিয়ে নিয়ে 'চুমান' স্ত্রী-আচার করে না। বীরসাকে তেল-হলুদে স্নান করিয়ে কোনো কনের বাপ কোলে বসায় না। পাঁচ-পঞ্চেশ এসে বিয়ে দেয় না। কোন বধুর সঙ্গে তিলক ও 'জনে' -ও বিনিময় করে না বীরসা —জল, আগুন, ধান, দুধ, তরোয়াল, তীর ও ধনুক। সাতটি জিনিসের সামনে দাঁড়িয়ে একে একে অঙ্গীকার করেন।" (১৭তম পরিচ্ছেদ) আমাদের বিশ্বাস নানা আচার-সংস্কার, বিশ্বাস- প্রথা, উৎসব -অনুষ্ঠান পালন করে মুণ্ডারা তাদের উপর নেমে আসা অত্যাচার-অবিচারকে সাময়িক

ভুলে থাকে। দিকুদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে তারা যে প্রতিরোধ গড়ে তোলে তার মানসশক্তির ভিত্তি গড়ে দেয় এই আচার-অনুষ্ঠানগুলো। এমন সব আচার-প্রথা-উৎসব থেকে শক্তি সংগ্রহ করে অতঃপর তারা নতুন উদ্যমে রুখে দাঁড়ায়। এই প্রেক্ষিতে বলা যায়, 'অরণ্যের অধিকারে' দেশজ-লোকজ ঘরানার উপন্যাসের অন্যতম বৈশিষ্ট্য যে আচার-বিশ্বাস-উৎসবের কথা আছে তা মুণ্ডা সমাজের জীবন-যুদ্ধের, জীবনবিবর্তনেরও সূচক— যা বাখতিনীয় দৃষ্টিভঙ্গির সাথে মিলে যায়।

তিনি

আজকের বিশ্বায়নের দুনিয়ায় চারপাশের বস্তাপচা আবর্জনাও খুব সহজেই খবরের শিরোনামে জায়গা পায় প্রথম সারিতে। সাহিত্যের ক্ষেত্রেও তাই চটুল নিছক বিনোদনসর্বস্ব লেখকরা ডলারের বিনিময়ে নিজেদের জীবনযাত্রাকে 'আরও বেশি সুন্দর— আরও অনেক বেশি সুন্দর করতে ব্যস্ত'। 'আরও বেশি সুন্দর' জীবনযাপনে অভ্যস্ত লেখক তাই গান্ধীজি, নেতাজি, ক্ষুদিরাম, প্রফুল্ল চাকীদের পাশাপাশি বীরসাদের কথা জানাতে ভুলে যান। আজ আমাদের তথাকথিত ভদ্র-সভ্যতার মানুষদের একথা ভেবে লজ্জা পাওয়া উচিত। মহাশ্বেতা দেবী স্বয়ং এ প্রসঙ্গে জানিয়েছেন—

''এক সাঁওতাল মেয়ে আমাকে বলেছিল আমরা স্কুলের বইতে গান্ধীর কথা পড়ি, ক্ষুদিরামের কথা পড়ি, নেতাজির কথা পড়ি। আমাদের কি কেউ ছিল না? কাজেই এদের তুলে ধরা দরকার। আমি তাদের বলেছি, ভারতের বিভিন্ন আন্দোলনে আদিবাসীরা নেতৃত্ব দিয়েছে।'' (নিজের সম্পর্কে মহাশ্বেতা দেবী : মহাশ্বেতা দেবীর অরণ্যের অধিকার : বাস্তবতার সন্ধানে। সম্পাদনা : সোহিনী ঘোষ)

এই উক্তি থেকেই বোঝা যায় মহাশ্বেতা চারপাশের বস্তাপচা বাস্তবটাকে পরিহার করে ভিন্ন এক বাস্তবতার কথনবিশ্ব গড়ে তুলতে উৎসাহী। বীরসাদের শোষণের ইতিবৃত্তকে অঙ্কন করে মহাশ্বেতা যে আধিপত্যাধীন জনগণের কথা বলেন— মূলত অবহেলিত আঙ্গিক দেশজ- লোকজ ঘরানার সাহায্যেই —এ কম কৃতিত্বের কথা নয়।